ভিমরাও রামজি আম্বেদকার

(B. R. AMBEDKER)

প্রাক্-কথন — আম্বেদকারের দর্শনকে জানার ও বোঝার নানা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে। এটি আসলে ভারতীয় সমাজের সামাজিক পুনর্গঠন সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদের অনুসন্ধান। আসলে আম্বেদকারের চিন্তা যা তাঁর বিভিন্ন লেখায় ও বক্তৃতায় প্রতিফলিত হয়েছে তা ভারতীয় সামাজিক চিন্তার ইতিহাস ও বিকাশের অনুসন্ধানের প্রেক্ষাপটে বেশী গুরুত্ব পেয়েছে। আম্বেদকারের রাষ্ট্রদর্শনে মূলতঃ নৈতিকতা ও ধর্মীয় বিষয় সংক্রান্ত আলোচনা দেখা যায়। সামাজিক নৈতিকতা তাঁর রাষ্ট্রদর্শনের কেন্দ্রীয় বিষয়। তাঁকে যেমন একজন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী বলা যায় না, তেমনি আবার রক্ষণশীল সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব হিসেবেও গণ্য করা যায় না। তাঁর গণতন্ত্র সম্পর্কিত ধ্যান ধারণায় সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ব যথার্থ স্বরূপে ধরা পড়ে। সমসাময়িক কালে দলিত আন্দোলনের উত্থানে তিনি প্রধান সেনানী হিসেবে আবির্ভূত হন। দলিত আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং আম্বেদকারের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার সারটুকু নিহিত রয়েছে তাঁর দুটি বিবৃতির মধ্যে—(১) আইনের দ্বারাই অধিকার সুরক্ষিত থাকে না বরং সমাজের সামাজিক ও নৈতিক বিবেকের দ্বারাই তা সুরক্ষিত হয় এবং (২) সরকারের গণতান্ত্রিক রূপের পূর্বস্বীকৃতি হল সমাজের গণতান্ত্রিক রূপ। তিনি মনে করতেন যে সামাজিক বিবেকের একটি রূপ হিসেবে গণতন্ত্র হল সব অধিকারের রক্ষাকবচ। গণতন্ত্রের চাবিকাঠিটি হল সামাজিক সম্পর্ক। আম্বেদকার ছিলেন প্রকৃত সামাজিক গণতন্ত্রী। রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তায় তাঁর মূল অবদান হল স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে সামাজিক গণতন্ত্রকে যুক্ত করা, যা পরিণামে সরকারের একটি রূপ হিসেবে গণতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হবে।

সামাজিক অমঙ্গলের সমালোচনা
(Critique of Social evils)

সমাজ এক বৃহত্তর মানব সমষ্টি। যদিও সব মানুষই সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে চায়, তবু তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে বিবাদ, কলহ প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাই নয় উচ্চতর শ্রেণীর ও নিম্নতর শ্রেণীর মধ্যে মর্যাদাগত ভিন্নতা গড়ে ওঠে। অবহেলিত, অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ধরনের হীনমন্যতা

বোধের সৃষ্টি হয়। এইরকম নানা অসাম্য ও অনৈক্য সমাজের মঙ্গলের বদলে অমঙ্গল ডেকে আনে। আম্বেদকার নিজেকে একজন অনগ্রসর শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপিত করে এই ধরনের বিভিন্ন সামাজিক অমঙ্গলের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। আমরা এইরকম কিছু সামাজিক অমঙ্গলের উল্লেখ করে আম্বেদকার কিভাবে তার সমালোচনা করেছিলেন বা প্রতিকারের প্রচেষ্টা করেছিলেন তা দেখাবো।

সেই সমাজকেই আমরা আদর্শ সমাজ বলবো যেখানে কোন অনৈক্য, অসাম্য, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, অবিচার, অত্যাচার, অনাচার থাকবে না; পরিবর্তে ন্যায়, সাম্য, মৈত্রী প্রভৃতি নীতির দ্বারা পরিচালিত হবে। তাহলে সমাজে ব্যাধি বা অমঙ্গল (evils) দেখা দেয় কখন? এক কথায় বলা যায় যখন সমাজে ন্যায়বিচারের (justice) বদলে অন্যায়, অবিচারের অবস্থা বিরাজ করে তখনই সামাজিক অমঙ্গল (Social evils) দেখা দেয়। আরো বলা যায় যখন একটি সমাজে সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ববোধ প্রভৃতি নৈতিক মূল্য কোন গুরুত্ব ও মর্যাদা পায় না, সেই সমাজে মঙ্গলের অভাব রয়েছে বলতে হবে। হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় বেশ কিছু অমঙ্গল আম্বেদকারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল এবং তিনি সেইসব অমঙ্গলের সমালোচনা তীব্র ও তীক্ষ্ণভাবে উপস্থাপন করেছিলেন।

[ক] আম্বেদকার লক্ষ্য করেছিলেন যে সমাজের অমঙ্গলের প্রধান প্রকারটি হল জাত প্রথা (caste system)। হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় এই জাতই ব্যক্তির মর্যাদা নির্ধারণে সব থেকে শক্তিশালী উপাদান। জন্ম সূত্রে নির্ধারিত এই জাত প্রথাই হিন্দু সমাজকে অসংখ্য পরস্পর সম্পর্কবিহীন উঁচু-নীচ শ্রেণীতে বিভক্ত করে। এই বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত প্রথাকে হিন্দু সমাজে ইস্পাত কাঠামো বলে গণ্য করা হতো। কেননা একজন ব্যক্তি কোন-না-কোন জাতে জন্মগ্রহণ করে। একবার সেই জাতিতে জন্মালে তার মর্যাদা যেমন নির্ধারিত হতো তেমনি তার যতই প্রতিভা থাকুক না কেন কোনওভাবে তার মর্যাদা পরিবর্তনের সম্ভাবনা ছিল না। যত সম্পদ ও প্রাচুর্য ঘটুক না কেন তার পদ মর্যাদা অপরিবর্তিতই থেকে যেতো। এবং তাই জন্ম সূত্রে তার বৃত্তি ও জীবিকাও নির্ধারিত হত। সেখানে ব্যক্তির কোন পছন্দ বা অপছন্দের স্থান ছিল না। আম্বেদকার আরও দেখেছিলেন যে ভারতবর্ষের বুকে এই যে জাতিগত স্তর বিন্যাস তার ভিত্তি হল সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিচার বিবেচনা। তার পর্যালোচনায় ধরা পড়েছিল,

জাত প্রথায় যে জন্মগত আভিজাত্য স্বীকৃত হয়েছিল তার মধ্যে কোন গুণগত স্বীকৃতি ছিল না। এই প্রথার ফলে ব্যক্তির মেধা ও যোগ্যতার স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক বিকাশ ঘটতে পারে না।

জাতপ্রথা নামক সামাজিক অমঙ্গলটি আর একটি অমঙ্গলের সৃষ্টি করেছিল, যার নাম অস্পৃশ্যতা (untouchability)। "জাত ব্যবস্থা ধর্মীয় ভাবে পূত শাস্ত্রীয় মর্যাদা লাভ করেছিল। বলা হয় ভগবান ব্রহ্ম এর আদি উৎপত্তিস্বরূপ। যদি কোন ব্যক্তি তার জাতের বিধান অমান্য করত, তবে তার আচরণ শুধুমাত্র জাতের প্রতি অপরাধ হতো তাই নয়, ধর্মের বিরুদ্ধে পাপাচার বলে গণ্য হতো। এইভাবে জাত বন্ধন ধর্মের মাধ্যমে সুরক্ষিত হয়েছিল।"[১] এই জাত ব্যবস্থার একটি মারাত্মক কুফল হল তা বিভিন্ন জাতের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করেছিল। এই ব্যবস্থা ব্যক্তির বসবাসের এলাকা নির্ধারণের ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত নিম্নতর জাতগুলোকে উচ্চতর জাত থেকে আলাদা করে রেখেছিল। 'গ্রামে এবং শহরে নিম্নতর জাতভুক্ত লোকেদের জন্য পৃথক পল্লী নির্দিষ্ট করে দেওয়া হত। উপরন্তু অস্পৃশ্য ও অন্যান্য অশুচিজাত অর্থাৎ জাত জর্জরিত হিন্দু সমাজে যারা একেবারে নিম্নতর পর্যায়ভুক্ত, তাদেরকে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য পাতকুয়া অথবা পুকুর থেকে জল নেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হতো। মন্দিরে প্রবেশের অধিকারও এদের ছিল না। জাতব্যবস্থা জনিত প্রচুর সামাজিক অত্যাচার এতটাই অমানবিক হয়ে উঠেছিল যে নিম্নতর পর্যায়ভুক্ত কোনো কোনো জাতকে যে শুধুমাত্র অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত করা হতো তাই নয়, তাদের কাছে যাওয়াও চলতো না। এমন লোককে দেখলেই কলুষিত হতে হতো, শুধু তাই নয়, তারা কেউ জ্ঞানত অথবা অজ্ঞানত শুচিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের দৃষ্টি পথে এসে পড়লে প্রায়শই তাকে অত্যন্ত নৃশংস শাস্তি ভোগ করতে হতো।'[২]

আম্বেদকার লক্ষ্য করেছিলেন যে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় জনসাধারণকে তাদের আপেক্ষিক সম্পদ, তাদের বৃত্তি, পরিবারের পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে যে বিভাজন করা হয়েছিল তা জাতপ্রথার দ্বারা দৃঢ়ভাবে গুরুত্ব পেয়েছিল। সমাজের মধ্যে সামগ্রিকভাবে প্রতিটি সামাজিক গোষ্ঠীর অবস্থান স্বীকৃত হয়েছিল। একটি সামাজিক গোষ্ঠী বা জাতের মানুষ অন্য একটি গোষ্ঠী বা জাতের

১। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি; এ. আর. দেশাই; পৃঃ-২০২।
২। তদেব; পৃঃ-২০২-২০৩।

মানুষদের প্রতি কি রকম আচার-আচরণ করবে সে বিষয়েও নিয়ম-কানুন চালু ছিল। এর ফলে অবহেলিত নিম্নবর্গের বা পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোর উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আশা-আকাঙ্খা অবদমিত হয়েছিল। আম্বেদকার ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বিদ্যালয় জীবনের শুরু থেকেই এইসব মানুষের দুঃখ-দুর্দশার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন বলে জাত প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তিনি বলেন প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হবে, তা হল, হিন্দু সমাজ এক অলীক ধারণা (myth)। এমনকি এই 'হিন্দু' নামটিও বিদেশী নাম। মুসলমান সাম্রাজ্যের আগে এই নামটি কোন সংস্কৃত রচনাতেও দেখা যায়নি। ফলে হিন্দু সমাজ বলে কোন সমাজেরই অস্তিত্ব ছিল না, তা আসলে ছিল জাতের এক সমষ্টি মাত্র। জাতপ্রথার দ্বারা যে শ্রম বিভাজন আনা হয়েছিল তার এক মারাত্মক ত্রুটি ছিল এই শ্রম বিভাজন পছন্দ বা নিজস্ব নির্বাচনের (choice) উপর নির্ভরশীল ছিল না। ব্যক্তিগত ভাবাবেগ স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনতার বিষয়কে অনুমোদন করে যেহেতু নিজের বৃত্তি নির্বাচনের ব্যাপারটির মধ্যে ব্যক্তির স্বাধীনতার ব্যাপারটি নিহিত থাকে। কিন্তু জাত ব্যবস্থায় কিছু ব্যক্তি কতকগুলো সুনির্দিষ্ট কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে বাধ্য হয়, যেগুলোর মধ্যে তাদের পছন্দ বা নির্বাচনের কোন ব্যাপার থাকে না।

[খ] আম্বেদকার যেহেতু জাত প্রথার উৎস খুঁজে পেয়েছিলেন হিন্দু ধর্মের মধ্যে, তাই হিন্দুধর্মকে তিনি খণ্ডন বা বর্জন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কেন? পৃথিবীর জীবন্ত (living) ধর্মগুলোর মধ্যে হিন্দুধর্ম অন্যতম। হিন্দুধর্মকে আর্যধর্ম নামেও অভিহিত করা হয়। হিন্দু ধর্মে 'ধর্ম' কথাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এর দ্বারা কর্তব্য, যথার্থ গুণ, নৈতিকতা, বিধি, সত্য, সততা বা সাধুতা বোঝায়। ধর্ম মুক্তির পথ দেখায়—বেশীর ভাগ ভারতীয়ই এই বিশ্বাস পোষণ করে। কিন্তু মনুস্মৃতি, বেদ প্রভৃতি গ্রন্থ জাতপ্রথাকে ঈশ্বর সমর্থিত বা ঐশ্বরিক প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য করায় পরিণামে তা নিম্ন শ্রেণীভুক্ত লোকেদের দুঃখ-কষ্টের কারণ রূপে প্রতিভাত হয়েছে। আম্বেদকার এই হিন্দু ধর্মের নিন্দা করেছিলেন এইভাবে—নিয়ম-সর্বস্ব, আচারনিষ্ঠ ও নিয়ন্ত্রণবিশিষ্ট এক ধর্ম যা অস্পৃশ্যতা ও জাতের উচ্চ-নীচ ক্রমের ভাবাদর্শের উপর গঠিত। হিন্দু ধর্মের অমঙ্গলসূচক বৈশিষ্ট্যগুলো আম্বেদকার নিম্নোক্তভাবে দেখিয়েছেন—

(ক) এই ধর্ম নৈতিক জীবন, স্বাধীনতা, স্বতঃস্ফূর্ততা প্রভৃতি থেকে মানুষকে বিশেষ করে অনগ্রসর মানুষকে বঞ্চিত করে এবং বাহ্যিকভাবে আরোপিত নিয়মগুলোর সঙ্গে সঙ্গতি সাধনের কথা বলে।

(খ) এই ধর্মে ধর্মীয় ধারণার প্রতি কোন বিশ্বস্ততা নেই, কেবল রয়েছে বিধি বা আদেশের সঙ্গে সঙ্গতিসাধন।

(গ) ধর্মপ্রচারক বা বিধি নির্মাতা নামে কয়েকজন ব্যক্তির দ্বারা এর আইন রচিত হয়নি।

(ঘ) এই ধর্মের নিয়ম রীতি বা আইনগুলোর মধ্যে কোন সংগতি নেই কেননা এখানে এক একটি শ্রেণীর জন্য এক এক রকম নিয়ম কানুনের বিধান দেখা যায়, যা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

(ঙ) এইসব বিধিগুলো চরম ও সুদৃঢ়ভাবে স্থিরীকৃত বলা যায়। তাই এই ধর্মকে ধ্বংস করতে হবে এবং এইরকম একটি ধর্মের বিনাশে কোন অন্যায় নেই।

আম্বেদকার যে ব্যাপারটিতে জোর দিয়েছিলেন তা হল মানুষকে এটি উপলব্ধি করতে সযত্ন হতে হবে যে তাদের যা বলা হচ্ছে তা ধর্ম নয়; তা বাস্তবিকপক্ষে আইন এবং এর বিলুপ্তি ও সংশোধনের দাবী অবশ্যই জানাতে হবে। হিন্দু ধর্ম ভারতীয় জীবন যাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে রেখেছিল। তিনি হিন্দু ধর্মের সমালোচনায় আরও বলেন যে এই ধর্ম স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি সদ্‌গুণের শিক্ষা না দেওয়ার ফলে জনসাধারণের কোন মঙ্গল বা কল্যাণ সাধন করতে পারে না। আম্বেদকার তাকেই যথার্থ ধর্ম বলে মনে করেন যা জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে ব্যক্তির কল্যাণ ও উন্নতি সাধন করবে; এবং ধর্ম সব মানুষকে একই সূত্রে গ্রথিত করবে। কিন্তু হিন্দু ধর্ম মানবিক সেবা প্রদান করার বদলে মানুষের বিশেষতঃ অনগ্রসর মানুষের প্রতি অন্যায় আচরণ করে। তাদের স্বার্থ সুরক্ষা করে না। তাই এই ধর্ম আম্বেদকারের বিবেকের কাছে আবেদন জানাতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বলেন যে-ধর্ম ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে স্বীকৃতি দেয় না, সেই ধর্ম তিনি মানেন না। হিন্দু ধর্মের এই অমঙ্গলসূচক বৈশিষ্ট্যগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রামই তাঁকে হিন্দুধর্ম পরিত্যাগের সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে দিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন— 'The religion which does not recognise the individuality of man is not acceptable to me'।

[গ] হিন্দু সমাজব্যবস্থায় আরও একটি অমঙ্গল দেখা গিয়েছিল, যা জাত প্রথার সঙ্গে প্রায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে ছিল—তা হল, এক শ্রেণীর মানুষকে অস্পৃশ্য বলে দূরে সরিয়ে দিয়ে তাদের যাবতীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। মানবিক অধিকার বলতে যা বোঝায় তার কণামাত্রও তারা ভোগ করতে পারেনি বরং তাদের উপর বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। 'অস্পৃশ্য' এই একটি বিশেষণ কেড়ে নিয়েছিল তাদের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ভোগের অধিকার। অন্যদিকে অসাম্যের ছবিটি ধরা পড়ে যখন দেখা যায় একই সমাজের কিছু মানুষ সব ধরনের অধিকার সুযোগ-সুবিধা অনায়াসেই ভোগ করছে, নিছক উচ্চ বর্ণের মানুষ হওয়ার দৌলতে। শুধু তাই নয় তারা অস্পৃশ্য ও তথাকথিত অচ্ছুৎ মানুষগুলোর উপর অন্যায়-অবিচার করার অধিকারও ভোগ করে থাকে। সমাজের মধ্যে এই যে অস্পৃশ্য ও স্পৃশ্যের বিভাজন তা দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে তা হিন্দু ধর্মের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল। মানুষ হিসেবে সকলেরই সমানাধিকার ও সমান সুযোগ-সুবিধা থাকা দরকার। কিন্তু হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার তথাকথিত অস্পৃশ্যরা বঞ্চিত ও অবহেলিতই থেকে গেছে।

আম্বেদকার লক্ষ্য করেছিলেন যে তথাকথিত অস্পৃশ্য ও অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষেরা মনুষ্যত্বের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত। তাদের উপর নির্মম ও অমানবিক আচরণও করা হয়েছিল। অস্পৃশ্য এই অজুহাতে তাদের চিকিৎসা, শিক্ষা, ধর্মানুষ্ঠানে যোগদান, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যগ্রহণ প্রভৃতি ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ছিল। আম্বেদকার বুঝেছিলেন এই সামাজিক অমঙ্গলটির মূলে রয়েছে সেই জাত প্রথা যা নির্মূল করার আবশ্যিক প্রয়োজন রয়েছে।

তিনি তাই জাত প্রথার অবলুপ্তি অর্থাৎ উচ্চ-নীচের ব্যবধান দূর করার মহান কর্মযজ্ঞে নিজেকে সামিল করেছিলেন। সব মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা, দলিত সম্প্রদায়ের অধিকার আদায় করার জন্য গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। পানীয় জলের অধিকার আদায়ে ও মন্দিরে গিয়ে অস্পৃশ্য মানুষগুলো যাতে পূজার্চনার অধিকার ভোগ করতে পারে তার জন্য আম্বেদকার সত্যাগ্রহ আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তবে মানবাধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আম্বেদকারকে প্রবল বিরোধিতা ও প্রতিকূলতার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। এই বাধা প্রধানত এসেছিল বর্ণ হিন্দুদের

কাছ থেকে। জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতা নামক দুটি সামাজিক অমঙ্গল সমাজে বজায় থাক্, এটি অনেক গোঁড়া ও সংরক্ষণশীল হিন্দুরা মনে প্রাণে চেয়েছিলেন। আম্বেদকার দেখেছিলেন ও জেনেছিলেন যে হিন্দু সমাজেরই একটি বড় গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল কেবলমাত্র এই কারণে যে তারা অস্পৃশ্য, তাদের স্পর্শে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা অশুচি হয়ে যাবে। কেবল এই অজুহাতেই তাদের বেশ কিছু প্রাথমিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। তাদের উপর এই জাতীয় কিছু অমানবিক সামাজিক পীড়ন করা হতো। সামাজিক, অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগের কারণে এইসব অস্পৃশ্যদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ও পরিত্যক্ত করে রাখা হয়েছিল। আম্বেদকার লক্ষ্য করেছিলেন যে এইসব সামাজিক পীড়ণ ধর্মের অনুশাসনের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল। কারণ হিন্দুধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন অসাম্য ও বৈষম্য ক্রিয়াশীল ছিল। আম্বেদকার দেখেছিলেন হিন্দু সমাজ কাঠামোটির মধ্যেই যত অসাম্য নিহিত রয়েছে। একেই জাতপ্রথা ও অস্পৃশ্যতার জনক বলা যায়।

হিন্দু সমাজের যে অবক্ষয় শুরু হয়েছিল তার মূলে ছিল এই জাতিভেদপ্রথা। ব্রাহ্মণরা বৌদ্ধিক দিক থেকে উন্নততর ও উচ্চতর না হওয়া সত্ত্বেও গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, সবসময়ই আধিপত্য বিস্তার করে এসেছে। উচ্চতর বর্ণের প্রতিভূ 'ব্রাহ্মণ'-দের গোঁড়ামী সামাজিক বিভেদ ও অনৈক্যের জন্ম দিয়েছিল এবং তার থেকেগোটা সমাজই ধীরে ধীরে অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যাওয়া শুরু করেছিল। বর্ণ ব্যবস্থায় সবার নীচে থাকা শূদ্র বা অন্ত্যজরা সংখ্যার বিচারে বৃহত্তর গোষ্ঠী হলেও তাদেরকেই সমাজের বাইরে করে রাখা হয়েছিল। একজন সত্যিকারের মানব প্রেমী হিসেবে এইসব বঞ্চিত, অবহেলিত, অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষদের মানবিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া ও সেগুলো সংরক্ষিত রাখার বিশাল দায়িত্ব আম্বেদকার নিজেই গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩৫ সালে অবদমিত ও অবহেলিত সম্প্রদায়ের প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তিনি তাঁর হিন্দুধর্ম ত্যাগের ঘোষণা এইভাবে করেছিলেন— 'I was born in Hinduism but I will not die as a Hindu'।

অস্পৃশ্যরা ভারতীয় সমাজের সবথেকে দারিদ্র-পীড়িত গোষ্ঠী। তাদের অধিকাংশই ছিল ক্ষেত মজুর বা আধা ক্রীতদাস অথবা সব থেকে নিকৃষ্ট বৃত্তিতে নিযুক্ত। তারা আর্থিক ও সামাজিক দ্বিবিধ অত্যাচারে পীড়িত হতো এবং এ

দুটোই পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। হীন সামাজিক অবস্থার দরুণ অস্পৃশ্যদের ওপর আর্থিক শোষণ তীব্রতর হতো এবং আর্থিক দুর্দশার ফলে তাদের সামাজিক অবস্থা অস্থায়ী হয়ে উঠেছিল।[১] এই সব অবস্থা দূর করার জন্য শিক্ষার বিস্তার ও কিছু ইতিবাচক আইন কানুনের দরকার যার দ্বারা উচ্চতর শ্রেণির বিরোধিতা সত্ত্বেও ওইসব অবহেলিত ও নিপীড়িত শ্রেণী অক্ষমতা দূর করতে পারে। একথা ঠিক যে এই অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষেরা সেরকমভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। তাদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি কোন সংহতি, গড়ে তুলতে পারেনি কোন সংগঠিত আন্দোলন ও প্রতিবাদী মঞ্চ। অতীতে কিছু বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ যে দেখা যায় নি তা নয়; কিন্তু তেমনভাবে প্রবল প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা যায়নি। এরকম এক চরম অবস্থার প্রেক্ষাপটে আম্বেদকার প্রধান সেনানী হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি এই অনগ্রসর শ্রেণীকে সংঘবদ্ধ করে সমাজ সংস্কারের আন্দোলনের রূপ দিতে চেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে 'অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন কালক্রমে বেগবান হয়ে উঠল, তার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় জনগণের বৃহত্তর জাতীয় ও মানবিক চেতনা প্রকাশ পেয়েছিল, অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন ভারতীয় জনগণের জাতীয় ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।'[২]

[ঘ] আম্বেদকারের দৃষ্টিতে আরও একটি সামাজিক অমঙ্গল হল ধর্ম। 'ধর্ম' বলতে হিন্দু ধর্মকে বুঝলে চলবে না। যদিও তিনি জীবনের প্রথম পর্বে হিন্দু ধর্মের মানুষ তবে 'ধর্ম' সম্পর্কীয় কিছু ভিন্ন ভাবনা তিনি পোষণ করতেন। তিনি ধর্মের চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছিলেন, যথা—

(১) প্রতিটি সমাজে নৈতিকতা অর্থে ধর্মকে হতে হবে নিয়ন্ত্রণ নীতি (governing principle)।

(২) ধর্মকে ক্রিয়াশীল হতে হলে তা বিচারবোধের দ্বারা চালিত হতে হবে যার নিছকই আর এক নাম বিজ্ঞান।

(৩) ধর্মের নৈতিক বিধি স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের মূল তত্ত্বকে স্বীকার করে নেবে। একটি ধর্ম যদি এই তিনটি সমাজজীবনের মৌলিক নীতিকে মেনে না নেয় তাহলে সেই ধর্মের ধ্বংস বা বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

১। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি; এ. আর. দেশাই; পৃঃ-২২৪।

২। তদেব; পৃঃ- ২৪৪।

(৪) ধর্ম দারিদ্র্যকে মহান ও পবিত্র করবে না।

এইসব বৈশিষ্ট্যকে মাথায় রেখে আম্বেদকার প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মের প্রতি তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন—(ক) খ্রীষ্টধর্মের প্রেম ও সহানুভূতি সম্পর্কিত যীশুখ্রীস্টের উপদেশ তাঁকে আকৃষ্ট করলেও তিনি তা খণ্ডন করেছিলেন কারণ এটি জাতিভেদপ্রথার কোন সমাধান করতে পারে না। (খ) ইসলাম ধর্মে একধরনের অন্ধত্ব ও উগ্রত্ব থাকার জন্য তিনি এই ধর্মকেও অনুমোদন করেননি। তাঁর মতে এই ধর্ম সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলার বদলে কেবল মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলেছে। তাছাড়া এখানেও শ্রেণীগত বৈষম্য উপস্থিত। (গ) তাঁর কাছে বৌদ্ধ ধর্মই যথার্থ ধর্ম কারণ জ্ঞান, সহানুভূতি ও সম্যক পথ এই তিনটি নীতির দ্বারাই একটি জীবন পরিচালিত হতে পারে। বৌদ্ধ ধর্মই সব সম্প্রদায়ের জন্য প্রত্যাশার কিরণ বা আলোর দিশারী। তিনি দাবী করেছিলেন যে গৌতম বুদ্ধ কৃতদাস বা ভৃত্য শ্রেণীর মানুষদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে চেষ্টা করেছিলেন এবং তিনি সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বুঝেছিলেন, যা দারিদ্র নিপীড়িত ও দুর্বল শ্রেণীর জন্য দরকার। আম্বেদকারের মনে হয়েছিল বৌদ্ধ ধর্মের মতগুলি হিন্দু সমাজের অন্যায় ও অসঙ্গত আচরণ ছাঁদের বিরুদ্ধে শুধু প্রতিবাদ নয় চ্যালেঞ্জও বটে।

আম্বেদকার প্রায় দীর্ঘ চল্লিশ বছর সংগ্রাম করেছিলেন এবং এমন এক ধর্মের সন্ধান করেছিলেন যেটি অবদমিত শ্রেণীর মানুষদের সামাজিক অমঙ্গলের বন্ধন থেকে মুক্ত করবে। তিনি এইরকম একটি ধর্মের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন যা ওইসব মানুষদের দুঃখ দুর্দশা ও কষ্টকে স্বীকার করবে, ঠিকভাবে বুঝবে এবং তাদের মানবত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবে। তিনি দলিতদের সম্মান ও শ্রদ্ধা চেয়েছিলেন। লৌক হিতৈষণা হিসেবে নয় অধিকার হিসাবে এবং অস্পৃশ্যদের মধ্যে স্বাধীনতা ও আত্ম নির্ভরতার মনোভাব জাগাতে চেয়েছিলেন। তিনি এক নতুন সমাজের ও স্বাধীন মানুষের জন্ম দেখতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করেন বিবেকানন্দ, গান্ধীজির মতো ব্যক্তিও সামাজিক সংস্কার করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছিলেন। মূলতঃ এই কারণে যে তাঁরা জাতপ্রথার পরিবর্তন ঘটাতে চাননি। ডঃ আম্বেদকারই প্রথম ব্যক্তি যিনি সারা বিশ্ববাসীকে জানিয়েছিলেন যে, জাতপ্রথার অঙ্গ বা অংশ হল অস্পৃশ্যতা এবং হিন্দু ধর্ম যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে তা হল এই জাতপ্রথা। জাতপ্রথাকে স্পর্শ করলেই হিন্দু ধর্মের সমগ্র বিগ্রহটিই ভেঙ্গে

পড়বে। কারণ, হিন্দু ধর্ম এক জাতব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। এর জন্যই আম্বেদকারের সামাজিক অমঙ্গলের সমালোচনায় একটি বৃহত্তর অংশ জুড়ে জাতপ্রথা ও পরোক্ষভাবে হিন্দু ধর্মের নিন্দা করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় 'মানবদরদী', 'সমাজ সংস্কারক', 'অবহেলিতের প্রতিনিধি' ইত্যাদি নানা বিশেষণে আম্বেদকারকে বিশেষিত করা হয়েছে। কিন্তু আসল কথা হল তিনি সমাজের বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তার সারা জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি সব সময় মনে করতেন— "One must distinguish between the freedom of a country and the freedom of the people in the country." বিভিন্ন সামাজিক অমঙ্গলের উৎস হিসেবে জাতপ্রথাকে বিবেচনা করে তিনি বলেছেন— "Hindu society gives more importance to the division of people and not the work. In other words, there is no place for the individual in the Hindu society." আম্বেদকার সামাজিক সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষদের রাজনৈতিক জাগরণের বিষয়টিতেও জোর দিয়েছিলেন। মানুষ সামাজিক প্রাণী, তারা তাদের স্বভাব অনুসারেই পরস্পর সম্পর্কিত ও নির্ভরশীল। একজন মানুষ কেবল সমাজেই তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে। কিন্তু জাত প্রথা বিশিষ্ট সমাজ ব্যক্তিকে সেই পরিবেশ ও স্থানটুকু দেয় না যাতে তার সামগ্রিক বিকাশ হয়।

দলিত আন্দোলন
(Dalit Movement)

'দলিত' শব্দটি একটি মারাঠী শব্দ যার অর্থ 'অবদমিত'। আম্বেদকার ও তাঁর অনুগামীরা এই শব্দটির ব্যাপক প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন। ভারতীয় ইতিহাসে দেখা যায় দলিত আন্দোলন শুরু হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই, যার মূল লক্ষ্য ছিল ভারতীয় সমাজের সব থেকে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠী যাদেরকে 'দলিত' বলে গণ্য করা হতো, তাদের উন্নতিসাধনে সংস্কারমূলক প্রচেষ্টা। পরবর্তীকালে এই আন্দোলন রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের দাবী নিয়ে এবং দলিত বা অস্পৃশ্যদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেবার ধারণাকে জাগানোর আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল। এই দলিত বা অস্পৃশ্যদের "The oppressed of the

oppressed and lowest of low"—অর্থাৎ নির্যাতিতদের মধ্যে সব থেকে নির্যাতিত এবং নিম্নদের মধ্যে নিম্নতম বলে বর্ণনা করা হতো, যারা অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সুযোগ সুবিধা থেকে কোনভাবেই উপকৃত হয়নি।

মহারাষ্ট্রে দলিত আন্দোলন সব থেকে দীর্ঘস্থায়ী ও সংগঠিত অভিজ্ঞতা। ১৯২২ সালে 'দলিত প্যান্থার' নামে একটি রাজনৈতিক দল মহারাষ্ট্রে গঠিত হয়েছিল। এখানেই নীচু জাতের মানুষগুলোকে সারা ভারতবর্ষে 'দলিত' নামে সংগঠিত করা হয়েছিল। পরবর্তী পর্বে দলিতদের মধ্যে আরো কিছু সম্প্রদায় যুক্ত হয়েছিল। এরও অনেক পরে অস্পৃশ্যদের মধ্যেই দলিত নামটির প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। দলিত আন্দোলন আরো পরবর্তী পর্বে কিছু রাজনৈতিক দলের মদতে সমাজের পিছিয়ে থাকা জাতিদের যেমন তপশিলী জাতি, উপজাতিদের জন্য বেশ কিছু অতিরিক্ত অধিকার ও সুযোগ সুবিধা আদায়ের কাজে মোটামুটি সফল হয়েছিল বলা যায়। তবে একথা প্রায় সকলেই স্বীকার করবেন যে ডঃ আম্বেদকারের নেতৃত্বেই দলিত আন্দোলন একটি সঠিক দিশা খুঁজে পেয়েছিল এবং একটি সংগঠিত রূপে দেখা দিয়েছিল। এই জন্যই আম্বেদকার যে-কোন অধিকার-সচেতন মানুষের কাছে এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকবেন।

প্রচলিত অর্থে দলিত আন্দোলন বলতে অস্পৃশ্য, অন্ত্যজদের জাতি নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগঠিত বিরোধিতাকে বোঝায়। তবে ব্যাপক অর্থে ব্রাহ্মণ্য ভাবাদর্শের কর্তৃত্ব বা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে নিম্নতর শ্রেণির মানুষদের সংগ্রামকে বোঝায় যা জাতপ্রথার ইতিহাসের সঙ্গেই অস্তিত্বশীল ছিল। আর এক অর্থে দলিত আন্দোলন, অবিচারপূর্ণ, অন্যায়, সামাজিক, অর্থনৈতিক বিভেদ-কাঠামো যা জাত প্রথার দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল তার বিরুদ্ধে অসংখ্য অবর্ণনীয় সংগ্রামের অস্পষ্ট রূপকে বোঝায়। ভারতের বুকে বিভিন্ন পর্যায়ে এই আন্দোলন দেখা দিলেও তা তেমন তীব্র আকার ধারণ করেনি। তবে নানা পর্যায়ের এই আন্দোলনের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক রয়েছে। যেমন—(ক) জাতি বিরোধী আন্দোলন মূলতঃ ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শের বিরুদ্ধে যারা অন্যায়-অবিচার পূর্ণভাবে সামাজিক কাঠামোটিকে আচ্ছাদিত করে রেখেছিল। (খ) হিন্দু ধর্মভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কিছু অবহেলিত, নির্যাতিত শ্রেণীর উপস্থিতি।

বৃটিশ উপনিবেশবাদী উদারনৈতিক তত্ত্ব অনেকখানি মুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। প্রাতিষ্ঠানিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন জনিত উদ্ভূত যে সামাজিক পরিবর্তন যা উপনিবেশবাদী সাম্রাজ্যে আসার ফলে নিম্নশ্রেণির মানুষগুলোর মধ্যে আকাঙ্খা, প্রত্যাশা সহ যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা যুগিয়ে ছিল; উন্নয়নের যেসব সুযোগ সুবিধা এইসব পরিবর্তন এনে দিয়েছিল তার সঙ্গে চিরাচরিত সামাজিক সম্পর্কের সংঘাত অনিবার্য ছিল যেহেতু তা তখনও জাতের বন্ধনে আষ্ঠেপৃষ্ঠে বেঁধে ছিল। এই ঔপনিবেশিক শাসন অ-সুবিধাভোগী সম্প্রদায়গুলোকে বিভিন্ন সুযোগ করে দিয়েছিল। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই শূদ্রদের দ্বারা প্রথমে সামাজিক প্রতিবাদী বা প্রতিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। খেটে খাওয়া বা পরিশ্রমী জাতি হিসেবে তারা পরাশ্রয়ী উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গে এক সরাসরি পারস্পরিক সংযোগ গড়ে তুলতে চেয়েছিল। ধর্মের নামে ব্রাহ্মণদের ভণ্ডামিপূর্ণ আচরণের কি উদ্দেশ্য এইসব আন্দোলন সকলের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিল। নিম্ন শ্রেণীর মানুষগুলো ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দ্বারা কতভাবেই যে অপমানিত, অত্যাচারিত, অবহেলিত হয়েছিল সেইসব বঞ্চনার অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি বৃটিশ শাসনকে বুনো ওলের জন্য বাঘা তেঁতুল, বা শত্রুর শত্রু হিসেবে অভিহিত করেছিল। যদিও দলিত আন্দোলন অনগ্রসর শ্রেণীর অব্রাহ্মণদের দ্বারা তাৎপর্যপূর্ণ ভাবেই প্রভাবিত হয়েছিল, কিন্তু তা খুব শীঘ্রই অব্রাহ্মণদের কাছ থেকে সরে গিয়েছিল। সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আম্বেদকারের আবির্ভাব জাতীয় তাৎপর্য ও গুরুত্ব লাভ করল।

দলিত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত লক্ষ লক্ষ মানুষ বিভেদ, হিংসা, শোষণ, অস্পৃশ্যতা, দারিদ্র, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা প্রভৃতির শিকার এরকম কথা বলা হত। দীর্ঘদিন ধরে তাদের নিম্নস্তরের মানুষ হিসেবে উল্লেখ করতেও দ্বিধা করা হয় নি। এখানে উল্লেখ্য যে দক্ষিণ ভারতের অ-ব্রাহ্মণদের উদ্যোগে নিম্ন শ্রেণীর মানুষের অধিকার প্রদানের উদ্দেশ্যেই দলিত আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল যা অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষদের জন্য শিক্ষা ও ভূমির দাবী জানিয়েছিল এবং জাত প্রথার কঠোরতা থেকে মুক্তি চেয়েছিল। অর্থনৈতিক দিক থেকে কিছুটা স্বচ্ছল, কিন্তু শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে থাকা অ-ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী ভূমি, সম্পদ, সরকারী চাকুরী ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্বকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এটি এক রাজনৈতিক আন্দোলনের আকার ধারণ করে। অ-ব্রাহ্মণ নেতারা, অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়

oppressed
নির্যাতিত
সামাজিক,
হয়নি।

মহারা
১৯২২ স
হয়েছিল।
সংগঠিত
হয়েছিল।
করা যায়
সমাজের
বেশ কিছ
হয়েছিল
ডঃ আম্বে
এবং এ
অধিকার
থাকবেন
(প্রচ
নির্যাতনে
ভাবাদর্শে
বোঝায়
দলিত
যা জাত
অস্পষ্ট
দিলেও
আন্দোল
যেমন—
অন্যায়-
(খ) হি

যেমন মুসলমান, ভারতীয় খ্রীষ্টান, অস্পৃশ্য ও উপজাতি আধুনিকতার ডাকে সাড়া দিয়ে নিজেদের স্থান করে নিতে চেয়েছিল ও সরকারী হস্তক্ষেপে আইনসম্মত অধিকার ও দক্ষতার আকাঙ্খা করেছিল। সরকারী চাকরীতে তাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ আদায় করেছিল।

আগে যারা 'শূদ্র' বলে অভিহিত হতো পরে তারা অ-ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের নিম্নতম শ্রেণী হিসেবে গণ্য হয়ে রাজনৈতিক ভাবে অস্পৃশ্য বলে সম্বোধিত হত। এরকম প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল যে অ-ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের দুটি শ্রেণী হবে—অনগ্রসর ও অস্পৃশ্য। এর ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্পৃশ্যদের তৎক্ষণাৎ গুরুত্ব বেড়ে গেল। শুধু তাই নয় সামাজিক ক্ষেত্রে এবং নিজেদের দৃষ্টিতে তাদের গুরুত্বের বৃদ্ধি ঘটল, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যাপারে সংখ্যাধিক্যের মর্যাদা বৃদ্ধি পেল। এইরকম প্রস্তাবও উঠে এসেছিল যে হিন্দু জনসমষ্টি থেকে অস্পৃশ্যদের বাদ দিতে হবে—কিন্তু নামী জাতীয় হিন্দু নেতারা এই প্রস্তাব গ্রহণ করেনি, সম্ভবতঃ এই কারণে যে, যে হারে অবিরাম হিন্দু জনসমষ্টির সংখ্যা কমতে শুরু করেছে তা সত্যিই এক উদ্বেগের বিষয়। এদিকে মুসলমানদের বিশেষ নির্বাচন অধিকার দেওয়ায় জাতীয় স্তরে স্বাধীনতা আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাই নেতৃত্বের মনে হয়েছিল ভারত ভাগ করার দূরভিসন্ধির জন্যই এইরকম প্রস্তাব করা হয়েছে। তারপর থেকে দলিত নেতাদের দাবী অনেক দূর বিস্তৃত হয়েছিল ও নানা পর্যায় অতিক্রম করেছিল। গোটা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ দলিত বা অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক অধিকার প্রদানের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এখানে উল্লেখ্য যে বিভিন্ন সময়ে দলিতদের জন্য বিভিন্ন নাম ব্যবহার করা হয়েছিল এবং প্রতিটি নামেরই বিশেষ গুরুত্ব ছিল।

১৯১১ সালে অস্পৃশ্য মানুষগুলোকে হিন্দু জনতার থেকে ব্রিটিশ শাসকদের বাদ দেবার প্রচেষ্টা এবং হিন্দুদের সংখ্যা কমে আসার জন্য জাতীয় নেতাদের উদ্বেগ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তাদের হিন্দু পরিচয় অক্ষুন্ন রাখার জন্য মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর অনুগামীরা তাদের 'হরিজন' নাম দিয়েছিলেন, যার অর্থ 'ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকা মানুষ' (people belonging to god)। এর জন্য গান্ধীজী হরিজনদের প্রতি সকলের সহানুভূতি ও মমত্ব সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন এবং এর পাশাপাশি তিনি হরিজনদের কাছেও স্বচ্ছ অভ্যাস পালন করার আবেদন জানিয়েছিলেন যাতে তারা সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে খোলামেলা ভাবে মিশতে পারে। দলিত নেতারা অবশ্য

এই নামটি অনুমোদন করেননি কারণ এটি ভীরু ও অসহায় ব্যক্তিদের বোঝায়, যারা অন্যের দয়া ও পরোপকার বৃত্তির উপর নির্ভর করে আছে, একজন গর্বিত ও স্বাধীন মানুষ হিসেবে নয়। এই সময়েই অস্পৃশ্যদের অসহনীয় অবস্থা ও নির্মম অবস্থা মানবতাবাদী ও সংস্কারকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। এইসব মানবতাবাদী অস্পৃশ্যদের হিন্দু সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন করা প্রতিরোধ করতে, নিম্নশ্রেণীর মানুষদের অমানবিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার কথা অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মানুষদের বলেন এবং অসংখ্য অনগ্রসর মানুষদের হৃদয়ে সহানুভূতি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। অস্পৃশ্য দূরীকরণের ব্যাপারটিতে তাঁরা সব থেকে বেশী গুরুত্ব দেন। তাঁরা যে বিষয়টি স্পষ্ট করতে চেয়েছিলেন তা হল 'অস্পৃশ্যতা' হিন্দুধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বর্ণব্যবস্থা বা জাত প্রথার ফলশ্রুতি নয়, এর কোন ধর্মীয় পবিত্রতা (sanctity) নেই বরং এটি হিন্দু ধর্মের উপর আরোপিত এক বাহ্য অবিশুদ্ধতা পাপজনক দাগ। তাঁরা শিক্ষা, নৈতিক পুনর্জাগরণ, লোকহিতৈষী মানসিকতার বৃদ্ধি ঘটাতে চেয়েছিলেন।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মঞ্চে ডঃ আম্বেদকারের আবির্ভাব অস্পৃশ্যদের আন্দোলনে নেতৃত্ব ও উদ্দীপনা জাগিয়েছিল। 'অবদমিত বা অসহায় শ্রেণী' (depressed class) 'দলিত', 'হরিজন' প্রভৃতি পদগুলো বিভ্রান্তিকর বা অবমাননাকর বা অবজ্ঞাজনক বলে তিনি এগুলো অনুমোদন করেন নি। তিনি একটি বিষয় স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন—রাজনৈতিক ক্ষমতার মাধ্যমেই অস্পৃশ্যদের সব সমস্যার সমাধান করতে হবে। তিনি অস্পৃশ্যদের আন্দোলনকে এক জাতীয় চরিত্র দান করেন।

আম্বেদকার ও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দলিত নেতারা হিন্দুদের উঁচু-নীচু এইভাবে ভাগ করার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন কেননা বর্ণ বা জাতপ্রথার অনিবার্য অনুসঙ্গী হিসেবে অস্পৃশ্যতা একটি সামাজিক ব্যাধি। আম্বেদকার প্রমুখ নেতারা নীচু জাতের মানুষদের ঐক্যবদ্ধ হবার শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং জাত প্রথা দূর করাকে তাদের প্রধান দায়িত্ব ও কর্মসূচী হিসেবে গণ্য করার কথা বলেছিলেন; কারণ তা কায়িক বা পরিশ্রমসাধ্য কাজ করা বাধ্যতামূলক করে এবং তাদের উপর বাধ্যতামূলক নানা নিষেধাজ্ঞা জারী করে ও সমাজের মূল স্রোতে যোগ দিতে বাধার সৃষ্টি করে। তাঁদের মতে, হিন্দুরা নীচু জাতের লোকেদের প্রায় মানুষ বলেই মনে করতো না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে 'কল্যাণকামী রাষ্ট্রের' (welfare state) ধারণাটি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো। স্বাধীন ভারত, এক সভ্য গণতান্ত্রিক সমাজ হিসেবে সমাজের নিমজ্জিত অংশকে তুলে ধরা ও তাদের অধিকার দেওয়াকে মানবিক দায়িত্ববোধ বা বাধ্যতাবোধ হিসেবে বিবেচনা করেছিল। সমাজের নীচের স্থানে অবস্থান করা লক্ষ লক্ষ মানুষের সীমাহীন দারিদ্র্য এবং স্বাধীনতার সময়ে সামান্যতম ক্ষমতারও অভাব বা অনুপস্থিতি ভারত সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য করেছিল। ভারতের সংবিধান সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের জন্য যত্ন সহকারে সামাজিক ন্যায়বিচার ও শিক্ষামূলক অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অধিকার প্রদান ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা সরকারকে দারিদ্র্য দূর করতে, রোজগার ও সম্পদের অসাম্যের ব্যাপারটি কমিয়ে আনতে এবং ক্ষমতা বিন্যাসে নীচে অবস্থানকারী মানুষগুলোর পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব দেওয়ার ব্যাপারে ইতিবাচক কর্ম পরিকল্পনা। এতদিন অস্পৃশ্যদের যে সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল তা সংরক্ষণের নীতির দ্বারা তাদের কাছে সহজলভ্য করা হল। জাতীয় ও প্রাদেশিক স্তরে সরকার বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী পরিকল্পনা ও নীতির সূচনা করেছিল যাতে তাদের কর্মসংস্থান এবং তাদের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ ঘটতে পারে।

আম্বেদকারের নেতৃত্বে দলিত আন্দোলন ভারতীয় সমাজের সব থেকে অ-সুবিধাভোগী মানুষগুলোর শক্তি ও ক্ষমতার বৃদ্ধি সাধন করতে চেয়েছিল। আম্বেদকার ভারতীয় জাতির আন্তর সংহতির প্রক্রিয়াটি শুরু করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে 'ভারতবর্ষকে জাতি (nation) বলে অভিহিত করা ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয়, হাজার হাজার বর্ণ বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত মানুষগুলো কিভাবে একটি জাতির অধীন হবে?' তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—"যদি না তুমি সামাজিক নিয়ম নীতির বদল ঘটাও তাহলে সামাজিক প্রগতির মাধ্যমে অতি সামান্যই লাভ করতে পারবে। সম্প্রদায়কে প্রতিরক্ষা ও আক্রমণ কোন ব্যাপারেই তুমি সংগঠিত করতে পারবে না। তুমি একটি জাতি গঠন করতে পারবে না, তুমি নৈতিকতা গড়ে তুলতে পারবে না। জাতির ভিত্তির উপর তুমি যা কিছু তৈরি করবে তা ভেঙ্গে পড়বে এবং কখনোই সমগ্র হিসেবে ধরা পড়বে না"।

সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসে ডঃ বি.আর.আম্বেদকার এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। সমাজের অবহেলিত, অনাদৃত মানুষদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজে তিনি নিরলস প্রয়াস চালিয়েছিলেন। দলিত আন্দোলন আসলে সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, তার আন্দোলনের নীতি ছিল অবদমিত ও অবহেলিত মানুষদের মুক্তির জন্য আত্মসম্মান (self-respect) ও মর্যাদা (dignity) আদায়। বাল্যকাল থেকে সমাজের তথাকথিত অস্পৃশ্য শ্রেণীর মানুষদের সামাজিক অসম্মান ও অমর্যাদার অভিজ্ঞতা তিনি ব্যক্তিগতভাবে লাভ করেছিলেন। আম্বেদকার এইভাবে ধীরে ধীরে দলিতদের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে আবির্ভূত হলেন। দলিতদের শুধু স্বতন্ত্র নির্বাচনবিধি প্রদান করলে সেইরকম ফল পাওয়া যাবে না মনে করে তিনি স্বতন্ত্র নির্বাচন নীতির দাবী প্রত্যাহার করে নেন। শীঘ্রই তিনি জাতপ্রথার বিলোপ সাধনের দাবী উত্থাপন করেন। কেননা তিনি মনে করেছিলেন দলিতদের দারিদ্র ও সামাজিক অবমাননার মূল কারণ হল এই জাতপ্রথা। শুধু তাই নয় অস্পৃশ্যতা ও সামাজিক অসাম্যের বিষময় বৃক্ষটিও ওই জাতপ্রথা থেকে জন্ম নিয়েছে। এটি আইনের শক্তিতেই বিলুপ্ত করতে হবে। তার মনে হয়েছিল এক অস্থায়ী ও সুদৃঢ় সমাজের ভিত্তি হল সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্য। ১৯৩৬ সালে তিনি নিজের একটি রাজনৈতিক দল গড়ে তুললেন যার নাম দিলেন I.L.P. (Independant Labour Party) যা দারিদ্র শ্রমজীবী শ্রেণী, ভূমিহীন কৃষক ও দলীত বা অবহেলিত মানুষদের মুখপত্র হিসাবে জনপ্রিয়তা লাভ করল। এই পর্বে তিনি এইসব দারিদ্র শ্রমজীবী মানুষদের প্রধান শত্রু হিসেবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও পুঁজিবাদকে চিহ্নিত করলেন। তিনি জাতপ্রথা বিরোধী নেতা হিসেবে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে মেহনতী ও শ্রমজীবী মানুষদের নেতা হিসেবে নিজেকে তুলে ধরলেন। দলিত আন্দোলনের প্রত্যয়টির বিস্তৃত বিবরণ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Annihilation of Caste'-এ লক্ষ্য করা যায়। জাতবিরোধী দলিত আন্দোলন ছিল মূলত সুবিধাভোগী ও সুবিধাভোগ-না করতে পারা শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম। এটিকে শাসক শোষকের শ্রেণী সংগ্রামও বলা যায়।

আমাদের মনে হয় দলিত আন্দোলনের মূল বিষয়গুলো যেমন রাষ্ট্র, ধর্ম, অন্যান্য শোষণের রূপ বা প্রকার ও কৃষ্টি—প্রভৃতির প্রতি এই আন্দোলনের ধ্যানধারণা নতুন করে ভেবে দেখা দরকার। এই আন্দোলনের প্রকৃত দাবীগুলোকে

আরো পরিষ্কারভাবে উপস্থাপনের দরকার আছে, যথা—স্বাধীনতা সাম্য, ভ্রাতৃত্বের উপর ভিত্তি করে সমাজ প্রতিষ্ঠা এর লক্ষ্য কিনা? অথবা শোষণের অনুপাত অনুসারে তা বদলাবে কিনা? এই আন্দালনে তাদের বন্ধু কারা, শত্রুই বা কারা সে বিষয়টি আর একবার ভেবে দেখার দরকার। তবে দলিত আন্দোলনের নির্মম আত্ম-সমালোচনার পাশাপাশি এই আন্দোলনের ইতিবাচক দিকগুলোকেও অস্বীকার করা যায় না— যেমন এই আন্দোলন স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্বের উপর ইতিবাচক বা ভাবাত্মক মূল্য আরোপ করেছিল, শোষণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়িয়ে তুলেছিল। কিন্তু অনুতাপের বিষয় হল এই আন্দোলনের লাভগুলোকে সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ করে তাদের দীর্ঘস্থায়ী সংরক্ষণ করা হয়নি। মনে হয় দলিত আন্দোলনের সচেতনতা ও মনোভাব তার জন্ম লগ্নেই যেন অপুষ্টির শিকার হয়েছিল।

বৈদিক বর্ণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আম্বেদকারের সমালোচনা ঃ

আম্বেদকার একজন সুদক্ষ পর্যবেক্ষকের মতো সমাজের বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ করে কোথায় কোথায় সামাজিক অসাম্য ও অনৈক্য রয়েছে তা একদিকে যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি অন্যদিকে তাদের কঠোর সমালোচনাও করেছেন। এই অসাম্য ও অনৈক্যের পিছনে আম্বেদকার একটি বড় কারণ খুঁজে পেয়েছিলেন এবং তাহল বৈদিক বর্ণব্যবস্থা। আর এই বর্ণব্যবস্থার উপর দাঁড়িয়ে থাকা সমাজে নানা অসাম্য ও অসঙ্গতির বিরুদ্ধে তিনি গর্জে উঠেছিলেন। একটি আদর্শ সামাজিক সংগঠনের ভিত্তি হবে স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ব। কিন্তু চতুবর্ণকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় ওই সব ভিত্তির প্রত্যাশা করা যায় না। তাই তিনি বৈদিক বর্ণ ব্যবস্থার সমালোচনা করেছিলেন। এই বর্ণব্যবস্থা সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক কেননা এটা সমাজব্যবস্থাকে দুর্বল ও পঙ্গু করে দেয়। বর্ণব্যবস্থায় কখনো সমাজ-জীবনে সম্প্রীতি সৌভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতা লক্ষ্য করা যায় না। এই বর্ণব্যবস্থাই যে যাবতীয় অসাম্য ও অনৈক্যের মূল কারণ তা আমরা অধ্যাপক ড. ভার্মার একটি উক্তিতে লক্ষ্য করি। তিনি বলেছেন— '...চারটি বর্ণ বা চতুবর্ণের উপর দাঁড়িয়ে থাকা সামাজিক কাঠামোর হিন্দু পরিকল্পনা যাবতীয় অসাম্যের যেমন জন্ম দেয় তেমনি পরিণামে জাতিব্যবস্থার জনকে পরিণত হয়'। আম্বেদকার বিভিন্ন তথ্যানুসন্ধান করে জানিয়েছিলেন যে একেবারে প্রাথমিক পর্বে তিনটি বর্ণ ছিল—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। শূদ্রদের অস্তিত্ব তখন ছিল না। এর বড় প্রমাণ ঋগ্বেদ। সেখানে চতুর্থ বর্ণ হিসেবে শূদ্রের উল্লেখ দেখা যায় না। পরবর্তীকালে আর্যদের একটি অংশ হিসেবে শূদ্রদের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। আম্বেদকার দেখিয়েছেন যে শূদ্ররাও প্রকৃতপক্ষে ক্ষত্রিয় ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সংঘাত সামাজিকভাবে তাদের অবস্থানকে বৈশ্যদেরও নীচে নিয়ে গেল। গোটা সমাজ ব্যবস্থাতেই ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য, শূদ্রদের প্রতি এক ধরনের ঘৃণা ও অবজ্ঞা, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে তাদের অংশগ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, সামাজিক স্থিতিকে বা সংহতিকে বিনষ্ট করে। আম্বেদকার তাই বর্ণ ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছিলেন।

আম্বেদকার 'Annihilation of the Caste' নামে বিখ্যাত বইটিতে বর্ণ ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছেন। কেননা তাঁর মনে হয়েছিল যে বর্ণব্যবস্থাতে যেহেতু গোষ্ঠীর প্রাধান্য থাকে তাই সেখানে ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব হতে বাধ্য। প্রতিটি ব্যক্তিরই যে স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা আছে, নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, তা বর্ণগোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ থাকলে সার্থকভাবে বিকশিত ও প্রকাশিত হতে পারে

না। বর্ণব্যবস্থায় বিভিন্ন বিধি-নিয়মের অনুশাসনের মধ্যে থাকলে ব্যক্তি তার স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ ঘটাতে পারে না।

আম্বেদকার তাঁর আর একটি গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, বর্ণব্যবস্থা সামাজিক ন্যায়ের (social justice) বিরোধী। কোন একটি বিশেষ বর্ণে জন্মগ্রহণ করেছে বলে সেই বিশেষ বর্ণের মানুষদের মানবিক অধিকার সম্মান ও সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা শুধু অনুচিতই নয়, তা অন্যায়ও বটে। এই রকম বৈষম্যমূলক পরিবেশে নিম্নবর্ণের ব্যক্তিরা তাদের মেধার বিকাশ সাধনের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়। বৈদিক বর্ণব্যবস্থা বেদ-নির্ভর। কিন্তু আম্বেদকার বেদেরও বিরোধিতা করেছিলেন। সব বর্ণের হিন্দুরাই বেদকে অপৌরুষেয় বিবেচনা করে তাকে অভ্রান্ত বলে গণ্য করেছিলেন। ফলে তেমনভাবে বেদ বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায় নি বা হিন্দু ভাবাদর্শকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়নি। এই আদর্শ মানুষকে ভবিষ্যতের সুখের কথা মাথায় রেখে বর্তমানের যাবতীয় অবিচতার, বৈষম্য মেনে নেবার উপদেশ দিয়েছে। আম্বেদকার পরকালের সুখ ও মুক্তির ধারণাকে 'অলীক', 'অবাস্তব', 'কল্পনাপ্রসূত' বলে সমালোচনা করেছেন।

আম্বেদকারের সামাজিক মানবতাবাদ (Ambedkar's social humanism) ঃ

ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে আম্বেদকার একজন সামাজিক মানবতাবাদী হিসেবেই পরিগণিত হন। কোন বিশেষ 'বাদ' (ism) তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চাননি, বরং সমাজের অবহেলিত উৎপীড়িত ও পিছিয়ে-পড়া মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও কল্যাণের ভাবনায় তিনি নিজেকে ব্রতী করেছিলেন। 'মানবতাবাদ' মানুষের শ্রীবৃদ্ধি ও সৌভাগ্য কামনা করে। মানবতাবাদীদের (humanists) কাছে জগৎভাবনা থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ জীবন ভাবনা। এই জীবন নিঃসন্দেহে মানব জীবন। মানুষকে প্রাধান্য দেওয়ায় কিসে মানুষের মঙ্গল হবে, উন্নতি হবে, এই ভাবনাতেই মানবতাবাদীরা নিজেদের নিবদ্ধ রাখেন।

আম্বেদকার একজন মানবতাবাদী হিসেবে সমাজের পুনর্গঠন, সামাজিক পরিকাঠামোতে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। তাই প্রথমেই তিনি সামাজিক ব্যাধিগুলোকে দূর করতে চেয়েছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে সমাজে অশিক্ষা, অস্পৃশ্যতা, দারিদ্র্য প্রভৃতি ব্যাধি রয়েছে। তাই একজন সত্যিকারের মানবতাবাদী হিসেবে সমাজ থেকে ওইসব ব্যাধি দূর করতে চেয়েছিলেন। হিন্দু সমাজব্যবস্থার গভীর বিশ্লেষণ করে এর বেশ কিছু ত্রুটি তাঁর নজরে এসেছিল। সেই সময়কার হিন্দু সমাজব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে বেশ কিছু জাতিগোষ্ঠীর সমষ্টি। ফলতঃ সেইসব জাতিগোষ্ঠীর এক-এক রকম উদ্দেশ্য ও অধিকার ভাবনা। কিন্তু তা সত্যিকারের এক সুসংগঠিত সমাজব্যবস্থা হতে পারে না। প্রত্যেক সমাজের এক অভিন্ন সাধারণ উদ্দেশ্য থাকবে, একই আদর্শ ও মূল্যবোধ থাকতে হবে। পারস্পরিক সম্প্রীতি সহানুভূতি, সেবা, সহিষ্ণুতা না থাকলে সেই সমাজের প্রগতির পথ রুদ্ধ।

মানবতাবাদী আম্বেদকার সব মানুষের সমানাধিকারের আন্দোলনে নিজেকে সামিল করেছিলেন। আর এই সমানাধিকার দেওয়া সম্ভব হতে পারে যদি দুটি প্রধান ব্যাধি দূর করা যায়। অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ প্রথা দূর হলেই সমাজে সকলের সমান অধিকার দেওয়ার ব্যাপারে কারো কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। সমাজের দলিত ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের অধিকার ও মর্যাদা আদায়ের প্রশ্নে তিনি ছিলেন অনমনীয়। অস্পৃশ্য মানুষগুলোকে যে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় তা তিনি নিজের

চোখে দেখেছিলেন। তাই তারা যাতে সমাজের উচ্চ সম্প্রদায়ের মতই সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা থেকে কোনভাবে বঞ্চিত না হয় অর্থাৎ তারা তাদের অধিকার অর্জন করতে পারে তার জন্য আপোষহীন সংগ্রাম করেছিলেন।

আম্বেদকার বুঝেছিলেন যে, সব মানুষকে সমানাধিকার দিতে হলে, অস্পৃশ্য অন্ত্যজদের বাসস্থান, পানীয় ইত্যাদিতে স্বাচ্ছন্দ্য আনতে হলে হিন্দু সমাজব্যবস্থার আমূল সংস্কারসাধন করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলা।

আম্বেদকারের উপর গৌতম বুদ্ধের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বৌদ্ধ ধর্মের উদারতা, মানব প্রেম তাঁকে সমাজ সংস্কারের কাজে উদ্দীপ্ত করেছিল। তবে আম্বেদকার মূলতঃ সেইসব মানুষদের বেদনায় কাতর হয়েছিলেন যারা জাতিগত বিচারে দলিত। সমাজের এইসব অনগ্রসর ও অবহেলিত মানুষগুলোর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ভাবনা, তাদের মুক্তির পথ দেখানোকে তাঁর সামাজিক মানবতাবাদের এক উজ্জ্বল দিক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

আম্বেদকারের বিভিন্ন গ্রন্থে মনোনিবেশ করলে দেখা যাবে যে ধর্ম, জাতপাত ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধেই তিনি সোচ্চার ছিলেন। সম্ভবতঃ নিজে এক তথাকথিত অস্পৃশ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করার জন্যই তিনি সব সময়ই সমাজের এইসব জনগোষ্ঠীর মঙ্গল, কল্যাণ ও প্রগতির ব্যাপারে জীবন ব্রত করেছিলেন, এইজন্যই তিনি চতুবর্ণ বিশিষ্ট হিন্দু বর্ণব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। হিন্দু সমাজব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য ও কর্তৃত্বও তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারেন নি বলে এটিরও বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। শৈশব থেকেই তিনি উচ্চবর্ণের মানুষদের কাছ থেকে পক্ষপাতমূলক আচরণ পেয়েছিলেন ও অনেক ক্ষেত্রেই তাঁকে বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছিল। তাঁর সামাজিক মানবতাবাদের উৎসস্থল সম্ভবতঃ এটিই। নিজে যে অবিচার ও বঞ্চনার শিকার হয়েছিলেন, সেইরকম যেন সমাজের অন্য মানুষদেরও হতে না হয়, সেদিকেই তিনি সজাগ দৃষ্টি ও আন্তরিক প্রয়াস দেখিয়েছিলেন। তাঁর এই ব্রতে তিনি কতখানি সফল হয়েছিলেন, সে প্রশ্ন ভিন্ন।

অনুশীলনী

১। সামাজিক অমঙ্গলের বিরুদ্ধে আম্বেদকার কীভাবে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২। 'দলিত' বলতে কী বোঝায়? দলিতদের আন্দোলন কিসের জন্য তা আম্বেদকারকে অনুসরণ করে আলোচনা করো।

৩। জাতপ্রথার বিরুদ্ধে আম্বেদকার কীভাবে আক্রমণ করেন?

৪। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আম্বেদকারের সমালোচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৫। টীকা লেখ ঃ

(ক) বৈদিক বর্ণব্যবস্থার বিরুদ্ধে আম্বেদকারের প্রতিক্রিয়া।
(খ) আম্বেদকারের সামাজিক মানবতাবাদের পরিচয় দাও।
(গ) ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি আম্বেদকার কী বলে আক্রমণ করেন?
(ঘ) আম্বেদকারের মতে ধর্মের চারটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।